# গণআন্দোলনে বিপ্লবী নেতৃত্ব কেন চাই

*কংগ্রেস সরকারের শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে পঞ্চাশের দশকের শেষের দিকে সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে শোষিত জনসাধারণ স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভে ফেটে পড়েছিল। মার্কসবাদী নামধারী তথা বামপন্থী দলগুলি সংকীর্ণ নির্বাচনী লাভের লক্ষ্যে কংগ্রেস সরকারের নৃশংস অত্যাচারে জর্জরিত সেদিনের অসংগঠিত গণবিক্ষোভকে দিশাহীনতার কানাগলিতে ঠেলে দিয়েছিল।*

*এই প্রেক্ষাপটে প্রদত্ত ভাষণে কমরেড শিবদাস ঘোষ আন্দোলনের এই শোচনীয় পরিণতির কারণ বিশ্লেষণ করে জনসাধারণের সামনে প্রকৃত মুক্তির রাস্তা কী, তার দিকনির্দেশ করেছেন।*

কমরেড সভাপতি ও উপস্থিত বন্ধুগণ,

আজকের এই সভা কেন আহূত হয়েছে তা আপনারা শুনেছেন। অনেক বিষয় আলোচনা করার আছে। গোটা দেশের পরিস্থিতি এত জটিল এত ঘোরালো হয়ে উঠেছে যা আলোচনা করতে চাইলে প্রচুর সময়ের দরকার। কিন্তু একটা সভায় সেটা সম্ভব নয়। তাই দু'একটা বিষয়ে আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই এবং মূল কয়েকটি কথা আপনাদের সামনে আমি রাখতে চাই। প্রথম কথা এই, কতকগুলো ঘটনা আজ সর্ববাদীসম্মত, যেটা আপনারা সবাই মনে প্রাণে অনুভব করছেন, প্রতিদিন আলোচনা করছেন, বিচার করে দেখছেন, তা হচ্ছে এই, দীর্ঘদিন ভারতবর্ষ রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন হলেও ভারতীয় সমাজের মৌলিক সমস্যাগুলোর কোনও সমাধান হয়নি। হ্যাঁ, রাস্তাঘাট হয়েছে, কলকারখানা কিছু কিছু হয়েছে। কিন্তু একদিকে যেমন নতুন নতুন কলকারখানা হয়েছে তেমনি অন্যদিকে বহু কলকারখানা লালবাতি জ্বালিয়েছে। বেকার সমস্যার কোনও সমাধান হয়নি। আমরা আগে জানতাম, কলকারখানা একটা দেশে হতে থাকলে বেকার সমস্যা ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে, শিল্পের প্রসার হতে থাকলে বেকারি হ্রাস পেতে থাকে। এই দেশে দেখছি উল্টো ব্যাপার। কিছু কিছু শিল্প-উদ্যোগ হচ্ছে। আমরা নাকি 'শিল্প বিপ্লবের' পথে পরিকল্পনাগুলোর মধ্য দিয়ে এগোচ্ছি। কিন্তু যত আমরা এই পরিকল্পনাগুলোর মধ্য দিয়ে এগোবার চেষ্টা করছি, দেখছি বেকার সমস্যা তত বেশি দিনের পর দিন বাড়ছে, বেকারি বাড়ছে। এর কারণ কী? আমাদের জাতীয় জীবনে এটা একটা মূল প্রশ্ন।

দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, সমস্ত জাতির নৈতিক মান দিনের পর দিন নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে। সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে আজ এটা একটা ভাবনার বিষয় হয়ে দেখা দিয়েছে। এটা আমাদের দেশ বলে আমরা এখানে গভীরভাবে ভাবছি, আমাদের ভাবতেই হবে। কিন্তু আজ যদি গোটা পুঁজিবাদী দুনিয়ার দিকে চেয়ে দেখেন তাহলে দেখবেন, এ বিষয়টা আন্তর্জাতিক সমস্যায় পরিণত হয়েছে। ইউরোপে, খোদ আমেরিকায় টিন্-এজারদের (কিশোর-কিশোরীদের) নিয়ে একটা সমস্যা। সেখানে সমস্ত জাতির নৈতিক মান আজ দ্রুতগতিতে নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে। কারণ কী? আমাদের দেশেও সবাই আমরা চিৎকার করছি যে, আমাদের সাংস্কৃতিক মান, জাতির নৈতিক মান নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে। কারণ কি ? এ আর একটা মূল প্রশ্ন। প্রধানত এই দুটো প্রশ্নের উপর আমি আলোচনা করব। তারপরে এই প্রশ্ন দুটোর সমাধান কী, তার উপরে যদি সম্ভব হয় কিছু আমি আপনাদের সামনে বলব।

প্রথম কথা, এদেশটা রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন হলেও একটা কথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে, 'দেশ' কথাটা আমরা যখন শুধু বলি, 'দেশের স্বার্থ' কথাটা যখন আমরা বলি বা যাঁরা বলেন, তাঁরা একটা আসল ফাঁকি নিজেদের কাছেও চেপে যান, জনতার কাছেও চেপে যান, সেটা হচ্ছে, এই দেশটা আজ আর অবিভাজ্য বা অবিভক্ত একটা দেশ নয়। আমরা চাই বা না চাই, আমাদের ভাল লাগুক না লাগুক, আমরা পছন্দ করি বা না করি, ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে আমাদের সমাজ শ্রেণীবিভক্ত। তার একদিকে মালিকশ্রেণী, যারা দেশের ধনসম্পদ এবং উৎপাদন ব্যবস্থার মালিক, যারা ব্যবসা-বাণিজ্য সমস্ত অধিকার করে রয়েছে। আর একদিকে যারা মালিক নয়, যারা নিজেদের শ্রমশক্তি বিক্রি করে কোনও রকমে দিন গুজরান করছে — হ্যাভ নট্স বা

সর্বহারার দল। ভাল লাগুক বা না লাগুক, সমাজের এই চিত্রটিকে কেউ তার মনগড়া কোনও তত্ত্বের দ্বারা তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দিতে পারে না। দিতে গেলেই বিপত্তি। আর সেই বিপত্তিই এদেশে হয়েছে। এদেশে রাজনৈতিক নেতারা এই মূল সত্যটিকেই 'দেশের স্বার্থ', 'জাতীয় পরিকল্পনা', 'জাতীয় উন্নতি' — এইসব কথা দিয়ে নিজেদের কাছেও চেপে রেখেছে, জনতার সামনেও চেপে রেখেছে, জনতাকে বুঝতে দেয়নি। এমনকী বামপন্থী নেতারাও যখন বক্তৃতা করেন, লেখেন, জাতীয় পরিকল্পনা নিয়ে পার্লামেন্টে বা অ্যাসেম্বলিতে বিতর্কে অংশ নেন, তাঁরা এই মূল সত্যটা সরাসরি তুলে ধরার চেষ্টা করেন না যে, একটা শ্রেণীবিভক্ত সমাজে কোনও পরিকল্পনা, 'জাতীয়' পরিকল্পনা, শ্রেণীস্বার্থ থেকে মুক্ত পরিকল্পনা হতে পারে না। হয় তা পুঁজিপতি শ্রেণীর স্বার্থে 'জাতীয়' স্বার্থের লেবেল এঁটে চলবে, আর না হয় শ্রমজীবি জনসাধারণের স্বার্থে, যেটা সত্যিকারের জাতীয় স্বার্থ, তার স্বার্থে চলবে। এই নিয়মকে গায়ের জোরে যারা অস্বীকার করতে চায় তারা আসলে নিজেদেরও ঠকায় যদি সৎলোক হয়, সৎ হলে তারা নিজেদেরও ঠকায়, জনতাকেও ঠকায় এবং এইভাবে দেশের মানুষ ঠকে আসছে। আর যদি অসৎ লোক হয় তবে তো কথাই নেই।

তাই আমি আপনাদের সামনে সোজাসুজি এই কথাটা বলতে চাইছি যে, আমাদের দেশে যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, রাষ্ট্রব্যবস্থা চালু রয়েছে তা পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা। কোনওরূপ বাক্যজাল সৃষ্টি করার দ্বারাই এ সত্যকে অস্বীকার করা অসম্ভব। যদিও আমি জানি, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বলে পরিচয় দেয় এবং নিজেদের সবচেয়ে কট্টর বিপ্লবী বলে হামেশাই প্রচার করে থাকে এমন দু'একটি রাজনৈতিক দল রয়েছে যারা নানা বাক্যজাল বিস্তার করে, বিশ্লেষণের নাম করে যেকোনও উপায়েই হোক এই সত্যটিকে অস্বীকার করার চেষ্টা করছে। যাই হোক, এদের এই কার্যকলাপ বা রাজনৈতিক বিশ্লেষণগুলোকে বিচার করে দেখা আজকের এই আলোচনায় সম্ভব নয়। তাই আমি এর মধ্যে যাচ্ছি না। পূর্বে আমাদের নানা আলোচনায় এবং লেখায় আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করেছি। এখানে আমি বিশেষ করে আমাদের এই পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার চরিত্র কী, তা মোটামুটি আপনাদের সামনে আলোচনা করবার চেষ্টা করব। আমাদের পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ব্যবস্থার সমস্যাগুলো সম্যক উপলব্ধি করতে হলে, ঠিক ঠিক বুঝতে হলে, বর্তমান পুঁজিবাদী দুনিয়ার চেহারা খানিকটা বোঝা একান্ত দরকার বলে মনে করি।

বর্তমান পুঁজিবাদী দুনিয়া আজ এক ঘোরতর সংকটের সম্মুখীন। এই সংকট একটা গতানুগতিক সংকট নয়। গত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত পুঁজিবাদী দুনিয়ায় এক ধরনের সংকট ছিল — সংকট ছিলই। বিংশ শতাব্দীতে পদার্পণ করার পর থেকেই — পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদে পদার্পণ করার পর থেকেই — সংকটে জর্জরিত। কিন্তু তবুও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর যে সংকটের সামনে আজকে বিশ্বের পুঁজিবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদ পড়েছে এর চরিত্র সম্পূর্ণ ভিন্নতর। এর সঙ্গে পুরনো সংকটের পার্থক্য হচ্ছে এই যে, পুরনো সংকটের মধ্যেও, হাজার সংকটের মধ্যেও, ১৯৩০-৩২ সালের বিশ্বব্যাপী মন্দা ও 'মনিটারি ক্রাইসিস' (আর্থিক সংকট) সত্ত্বেও সামগ্রিকভাবে বিশ্বপুঁজিবাদের বাজারে একটা রিলেটিভ স্টেবিলিটি ছিল, একটা আপেক্ষিক স্থায়িত্ব ছিল। এই কথাটি আমি কেন বলছি তা বুঝতে হলে একথা বোঝা দরকার যে, পুঁজিবাদী দুনিয়া এবং তার সমাজ, তার উৎপাদন ব্যবস্থা হচ্ছে বাজারভিত্তিক। চাহিদা ও জোগানের উপর তার সমস্ত উৎপাদন ব্যবস্থার বুনিয়াদ খাড়া হয়ে আছে। মানুষের প্রয়োজন, তার ভিত্তিতে পরিকল্পনা এবং তার ভিত্তিতে উৎপাদন এবং সেই অনুযায়ী বণ্টন — এ পুঁজিবাদী অর্থনীতির ধরনই নয়। পুঁজিবাদী অর্থনীতির ধরন হচ্ছে — বাজারের চাহিদা, মানুষের ক্রয়ক্ষমতা, আমি বিক্রি করে কত লাভ করব, সোজা কথায় এই হল পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বুনিয়াদ। তাই বাজারের যদি স্থায়িত্ব না থাকে তাহলে পুঁজিবাদী অর্থনীতি টলটলায়মান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত, হাজার সংকট সত্ত্বেও, বহু মন্দা সত্ত্বেও, পুঁজিবাদী বাজার বরাবর একটা আপেক্ষিক স্থায়িত্ব রক্ষা করেছে। কিন্তু এবার বিশ্বযুদ্ধের পরে যে সংকট সে এবেলা ওবেলার সংকট। পূর্বেকার আপেক্ষিক স্থায়িত্বের নিয়ম পুঁজিবাদী বাজারে আজ আর নেই। সেটা শেষ হয়ে গেছে। বিশ্ব পুঁজিবাদী বাজারের সে অবস্থাটা আজ আর নেই। আর এটা না থাকার ফলে এ যুগের যে কোনও পুঁজিবাদী দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বুনিয়াদ একটা নতুন বিশ্ব পরিস্থিতির মধ্যে অবস্থান করছে। তাই ঊনবিংশ শতকের শেষপাদ পর্যন্ত ইউরোপ-আমেরিকার বিভিন্ন দেশ পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে তাদের যে বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হয়েছিল, সে যুগে তাদের দেশের পুঁজিবাদের এবং পুঁজিবাদী শিল্পায়নের বিকাশ যে গতিতে, যে পদ্ধতিতে, যে আদর্শবাদের ভিত্তিতে হু হু করে ঘটেছিল, আমাদের দেশেও কেন আজ এই পিছিয়ে- পড়া পুঁজিবাদী অর্থনীতির, আমরা যদি একটু পরিকল্পনা

করি, তাহলে পুঁজিবাদী কাঠামোর মধ্য দিয়েই কেন সেইরকম হু হু করে অগ্রগতি হবে না, এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে বর্তমান বিশ্বপুঁজিবাদী বাজারের এবং বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির বৈশিষ্ট্যকে বুঝতে হবে। তাহলেই আমরা বুঝতে পারব, কেন আমাদের দেশে একদিকে পরিকল্পনা আর একদিকে সংকট — একই সঙ্গে পাশাপাশি চলছে। আমরা পরিকল্পনা করছি, কিন্তু আমাদের পরিকল্পনার সঙ্গে সবসময় একটা সংকটের ছায়া মিশে আছে। একদিকে আমরা লোকের কর্মসংস্থানের বন্দোবস্ত করছি, আরেকদিকে যে শিল্পগুলো চালু আছে সেগুলো ধসে পড়ছে। সেগুলোকে আমরা টিকিয়ে রাখতে পারছি না। বর্তমান পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে আমরা আমূল ভূমিসংস্কার করতে পারি না। কারণ যদি কারিগরি বিজ্ঞানের সাহায্যে, উন্নত যন্ত্রপাতির সাহায্যে আমরা চাষবাস করতে যাই তাহলে এক ধাক্কায় গ্রামে যে মজুর উদ্বৃত্ত হবে, তারা শহরে আসবে। তাতে সমস্ত শহর ভেঙে পড়বে বিশাল বেকারবাহিনীর চাপে। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থার শাসনকর্তারা এর ঝক্কি নিতে কোনমতেই সাহস করতে পারে না। কারণ গ্রামীণ এই উদ্বৃত্ত মজুরদের কাজ দেওয়ার মতো শিল্প পরিকল্পনা করার ক্ষমতা শাসকদের নেই। তেমন দ্রুতগতিতে শিল্পবিকাশ ঘটানো বর্তমান পুঁজিবাদী কাঠামোর মধ্যে কোনওমতেই সম্ভব নয়।

কিছু কিছু পরিকল্পনা হচ্ছেই, তা করতেই হবে সরকারকে। কিন্তু পরিকল্পনাগুলো করতে গিয়ে তারা পদে পদে মার খাচ্ছে। দুটো কারণে মার খাচ্ছে। এক হচ্ছে, বিশ্বের পুঁজিবাদী বাজারে পূর্বেকার সেই আপেক্ষিক স্থায়িত্ব আর নেই। উপরন্তু সেখানে চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা। আগের পুঁজিবাদী দেশগুলো কী রকম পরিবেশে বিকাশ লাভ করেছে? সমস্ত বিশ্ব তাদের কার্যত উপনিবেশ ছিল। তারা নিজেদের মধ্যে দুনিয়ার বাজারের ভাগ বাঁটোয়ারা করে তার ভিত্তিতে তাদের বিকাশ ঘটিয়েছে। আর আজ আমাদের মতো পিছিয়ে-পড়া পুঁজিবাদী দেশগুলোর সামনে পরিস্থিতি কী ? একদিকে এই নতুন, অধুনা স্বাধীনতাপ্রাপ্ত প্রত্যেকটা দেশই নিজেদের গড়ে তুলতে চাইছে এবং প্রত্যেকটা দেশই পুঁজিবাদী ঢং-এ তাদের অর্থনীতিকে গড়বার চেষ্টা করছে। পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সঙ্গে তাদের বাজারে প্রতিযোগিতা। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক বাজারের চেহারা কী? পুঁজিবাদী দুনিয়ার থেকে একটা বিরাট অংশ, সমাজবাদী দুনিয়া, আগেই বেরিয়ে গেছে। বাকি যে অংশটা পুঁজিবাদী বিশ্ব-বাজার হিসাবে রইল, সেখানে হাজার প্রতিযোগী। এই অবস্থায় পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে — যারা পিছিয়ে-পড়া দেশ তারা সব এক হয়ে একটা মোকাবিলা করার চেষ্টা করছে। আবার এই তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে পড়া পুঁজিবাদী দেশগুলো নিজেরাই পরস্পরের মধ্যে টক্কর লড়ছে। তাদের মধ্যেই ঝগড়া। এদের মধ্যে যে একটু মোড়ল, যে একটু অর্থনৈতিকভাবে সুসংহত, সে অপরকে দাবাতে চাইছে। অপরের বাজারে নিজের পুঁজি লগ্নি করতে চাইছে, অপর দেশে নিজের রপ্তানি বাড়াতে চাইছে, তাকে মূলত আমদানিকারক দেশে পর্যবসিত করার চেষ্টা করছে। ফলে এখানেই দ্বন্দ্ব দেখা দিচ্ছে।

আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদী বাজারের এই যে তীব্র দ্বন্দ্ব, সংঘাত এবং সংকট — এটা হচ্ছে একটা দিক। আরেকদিকে আমাদের দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা কী? বেশিরভাগ লোক বেকার হচ্ছে। মজুররা খুবই কম মজুরি পায়। দেশের শতকরা ৭৫ ভাগ লোক চাষী, তাদের বছরে ৩ মাসের বেশি কাজ নেই। এই যে বিরাট জনসংখ্যা যেটা গ্রামে থাকে, তার ক্রয়ক্ষমতা একেবারে নেই বললেই চলে। অথচ পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে উৎপাদন হয় না যদি সেই উৎপাদন লাভ রেখে বিক্রি করা না যায়। সেই উৎপাদন তারা করবে না। এ অবস্থায় মালিকরা কম উৎপাদন করবে এবং তা বেশি দামে বিক্রি করবে অল্পলোকের মধ্যে। এভাবে অল্পলোকের মধ্যে বেশি দামে বিক্রি করে তারা লাভটাকে তুলে নেবে। ফলে জনসাধারণের অভাব তো ঘটবেই এ দেশে। কারণ বুনিয়াদি নিয়মে এখানে পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে উৎপাদন হচ্ছে। তাই একটা জিনিস লক্ষ করবেন যে, দিনের পর দিন এদেশের আভ্যন্তরীণ বাজার সংকুচিত হচ্ছে। এদেশের গরিব মানুষদের, এদেশের চাষী-মজুর ঘরের মেয়েদের আমরা কাপড় পরাতে পারছি না। এদেশের প্রত্যেকটা লোকের গায়ে জামা আমরা তুলে দিতে পারিনি। কিন্তু আমাদের দেশের টন টন কাপড়, আমাদের দেশের মজুররা যা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তৈরি করে, তা বিদেশের বাজারে চলে যায়। ধূয়া তোলে ওরা — আমাদের বিদেশি মুদ্রা চাই, তাই আমাদের রপ্তানি বাড়াতে হবে। কারণ শিল্পের বিকাশের জন্য বিদেশ থেকে যন্ত্রপাতি আমাদের আমদানি করতে হবে। আসলে এটাও আরেকটা মস্ত বড় ফাঁকি। এর একটা প্রয়োজন আছে ঠিকই। কিন্তু এর আরেকটা দিকও রয়েছে। সেটা হচ্ছে বিদেশের বাজার ছাড়া ঐ মাল এখানে গুদামজাত হয়ে যাবে। এখানে কেনবার লোক নেই। এখানে যে দামে বিক্রি হবে সে দামে কেনবার লোকের সংখ্যা কী? কেনবার মানুষ নেই তা নয়, কিন্তু ঐ দামে কেনবার

মানুষ নেই। অর্থাৎ জিনিসপত্রের ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধির তুলনায় আয় এত সামান্য যে, মানুষের ক্রয়ক্ষমতা ক্রমাগত নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে। স্বল্প মজুরির শ্রমিক, বিরাট বেকারবাহিনী এবং ৭৫% চাষীর কার্যত কোনও কেনবার ক্ষমতা নেই। তাহলে দেশের এ অবস্থায় অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটবে কীভাবে? 'পরিকল্পনা', 'পরিকল্পনা' বলে চিৎকার করলেই হবে? ফলে আমাদের দেশের গোটা অর্থনীতি আজ একটা সংকটের মধ্যে পড়েছে।

এখানে আরেকটা কথা আপনাদের আমি বলতে চাই। একথাটা আমি আমাদের দেশের অনেক অর্থনীতিবিদকেও বলতে চাই। যে কারণেই হোক, অনেকেই এই কথাটা বুঝতে চান না বা মানতে চান না। কিন্তু আমি যেটা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি সেটা আমি আপনাদের সামনে রাখব, আপনারা ভেবে দেখবেন। অনেকে মনে করেন, আমাদের দেশ তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে-পড়া দেশ, তাই নাকি এদেশে ফ্যাসিবাদের ঝোঁক কোনওমতেই দেখা দিতে পারে না, এদেশে শিল্পে সামরিকীকরণের ঝোঁক দেখা দিতে পারে না। কিন্তু পিছিয়ে-পড়া পুঁজিবাদী দেশ হলেও, আমি মনে করি, আমাদের দেশে ঠিক এই ঘটনাই ঘটতে শুরু করেছে। এই যে 'সামরিক বাজেট বাড়াও' রব উঠেছে এবং ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি (জাতীয় জরুরি অবস্থা) আজও টিকে রয়েছে, এর পিছনে একটা গুরুতর অর্থনৈতিক কারণ রয়েছে। এর বুনিয়াদটা এইখানেই যে, যতটুকু শিল্প পরিকল্পনা এখানে হচ্ছে, যতটুকু ইস্পাত শিল্প এখানে গড়ে উঠছে তাতে সবরকম উন্নতমানের ইস্পাত এখনও পর্যন্ত আমরা তৈরি করতে না পারার দরুণ নিজেদের প্রয়োজন মেটাবার জন্য যেমন নানা ধরনের উন্নতমানের ইস্পাত একদিকে বাইরের থেকে আমাদের আমদানি করতে হচ্ছে, অপরদিকে আবার এইসব স্টিল প্ল্যান্টগুলোতে যেসব ইস্পাত উৎপাদন হচ্ছে তার অনেকখানি আমাদের বিদেশের বাজারে বিক্রি করতে হচ্ছে। কারণ নিজের দেশের বাজারে সেগুলো যে বিক্রি হবে তা কীসে লাগবে? শুধু 'ইস্পাত উৎপাদন বাড়াও বাড়াও' করলেই তো হবে না, স্টিল তো আর আপনি খাবেন না ! যদি নিজের দেশে বিভিন্ন ধরনের ভোগ্যপণ্য শিল্প এবং নানা ধরনের হাল্কা শিল্প হু হু করে বাড়তে না থাকে, তাহলে এই ইস্পাত কীসে লাগবে ? ফলে যে ইস্পাত আমরা ইতিমধ্যেই উৎপাদন করছি, বাইরের বাজার সংকটের দরুণ এই ইস্পাত বিক্রির জন্য আভ্যন্তরীণ বাজারে একটা কৃত্রিম তেজিভাব চাই। নাহলে এই ইস্পাত কোথায় বিক্রি হবে? কারণ আভ্যন্তরীণ বাজার সংকুচিত হচ্ছে, বাইরের বাজার মন্দা। এই অবস্থায় একদিনে তো লালবাতি জ্বলে যাবে, সমস্ত স্টিল প্ল্যান্টের উৎপাদন বন্ধ হয়ে যাবে, মাল জমে যাবে, মজুত হয়ে যাবে। তাই আভ্যন্তরীণ বাজারে কৃত্রিম তেজিভাব তৈরির প্রয়োজনেই রাষ্ট্রকে ক্রমাগত নিজেই এই ধরনের উৎপাদনের ক্রেতা হতে হচ্ছে। তাই রব উঠছে 'প্রতিরক্ষা শিল্প বাড়াতে হবে' — দেশের মানুষ খেতে পাক আর নাই পাক। যেখানে বাইরের বাজারে সংকট, আভ্যন্তরীণ বাজারও সংকুচিত সেখানে ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থায় শিল্পোদ্যোগের ধারাকে খানিকটা অব্যাহত রাখতে হলেও প্রতিরক্ষা শিল্প এবং সামরিক কাঠামো গড়ে তুলতে হবেই। তাই ডেফিসিট ফিন্যান্সিং-এর (ঘাটতি বাজেটের) উপর ভিত্তি করে মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি করে রাষ্ট্র ক্রেতা হচ্ছে ইস্পাতের এবং ডিফেন্স-এর জন্য প্রয়োজনীয় নানা ধরনের জিনিসের আভ্যন্তরীণ ও বহির্বাজারের সংকট থেকে দেশের পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে মুক্ত করার এই যে বিশেষ অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তা, এটাই 'আমাদের প্রতিরক্ষাকে শক্তিশালী করতে হবে', এই মনোভাবের পেছনে অনেকটা কাজ করছে। কিন্তু একথাটা দেশের মানুষকে বলা যায় না। তাই দেশের মানুষের কাছে একটা 'রাজনীতি' চাই — সেটা হচ্ছে 'ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি', 'দেশ বিপন্ন চারিদিক থেকে', 'গোটা ভারতবর্ষকে খেয়ে ফেলবার জন্য চারিদিক থেকে লোক রয়েছে, গিলে খেল বলে আমাদের, তাই আমাদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করতে হবে ডিফেন্স-এর জন্য'। কিন্তু এরও আসল আর একটা কারণ যে অর্থনীতিতেই নিহিত রয়েছে তা আমাদের বুঝতে হবে। তা হচ্ছে ভারতের অর্থনীতি সংকটজর্জরিত অর্থনীতি। সামরিকীকরণের মধ্য দিয়ে গিয়ে সে নিজেকে খানিকটা ভারমুক্ত করবার চেষ্টা করছে। আমার একথাটা যে সত্যি তার প্রমাণ এইখানে যে, আজও আমাদের দেশে ইমার্জেন্সি ও ডিফেন্স অব ইন্ডিয়া রুলস (ডি আই আর) টিকিয়ে রাখা হয়েছে। দেশের প্রায় সমস্ত স্তরের মানুষ, সমস্ত রাজনৈতিক দল বারবার ইমার্জেন্সি তুলে নেওয়ার দাবি জানিয়েছে। তা সত্ত্বেও কেন ইমার্জেন্সি আজও তুলে নেওয়া হচ্ছে না এবং ডি আই আর নাকচ করা হচ্ছে না? গত চার বছর যাবৎ আমাদের উত্তর সীমান্ত শান্ত অবস্থায় রয়েছে। পাকিস্তানের সঙ্গেও আমাদের যুদ্ধাবস্থার অবসান হয়েছে এবং তাসখন্দ চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। তৎসত্ত্বেও, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সম্মিলিত দাবি সত্ত্বেও কেন আজও ইমার্জেন্সি এবং ডি আই আর তুলে নেওয়া হচ্ছে না — এর সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক তাৎপর্য বুঝতে হলে আমি একটু আগেই যে আলোচনা

আপনাদের সামনে করেছি, যদিও তা খুব সংক্ষিপ্ত আকারে, তার তাৎপর্য আপনাদের সম্যক উপলব্ধি করতে হবে। তা এই হল আমাদের 'সমাজবাদী' সমাজের পরিকল্পনাগুলোর ভিতরকার সত্যিকারের চেহারাটা। এই হল আমাদের পরিকল্পনাগুলোর, 'জাতীয়' পরিকল্পনাগুলোর আসল তাৎপর্য এবং ভেতরকার চেহারা। কাজেই যখন খাদ্য পাই না, 'সিভিল লিবার্টি' (নাগরিক অধিকার) নেই, হেন নেই, তেন নেই বলে চিৎকার করি এবং আন্দোলন করি তখন ভারতবর্ষের বর্তমান অর্থনীতির এই চিত্রটি সম্পর্কে এবং শাসকশ্রেণীর চরিত্র সম্পর্কেও পরিষ্কার ধারণা আমাদের থাকা প্রয়োজন।

এখানে আরেকটা কথাও আমি আপনাদের সামনে আলোচনা করতে চাই। আমাদের দেশে যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে যখন এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিপ্লবাত্মক লড়াইয়ের একটা প্রচন্ড ঢেউ চলছিল তখন অতবড় সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মুক্তি আন্দোলনকে পিছন থেকে ছুরিকাঘাত করে এদেশের টাটা-বিড়লাদের দলের রাজনৈতিক নেতারা আর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা। একটা বিপ্লবাত্মক লড়াই যখন গড়ে উঠছিল, তেমন সময়ে অতি সুন্দর এবং সুকৌশলে আপস করে স্বাধীনতা নামক একটি মাদকদ্রব্য খাইয়ে আমাদের ঝিমিয়ে দিল। গোটা দেশের স্বাধীনতা চলে গেল বুর্জোয়াদের হাতে, পুঁজিপতিদের হাতে। আমরা নাচতে আরম্ভ করলাম — দেশ স্বাধীন হয়েছে। একথার অর্থ এ নয় যে, দেশ স্বাধীন হয়নি। আমি বলছি, হ্যাঁ দেশ রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু বাবা, আমরা তো শুধু জাতীয় স্বাধীনতাই চাইনি। আমরা চেয়েছিলাম মজুর-চাষীর রাজত্ব, জনসাধারণের সত্যিকারের গণতান্ত্রিক অধিকার, বাঁচবার অধিকার। কারণ একটা কথা আমরা সেদিনও বুঝেছিলাম যে, ইংরেজের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত সমগ্র জাতি একটি অবিভাজ্য জাতি নয়, তা আসলে পরস্পর বিরোধী দুইটি শ্রেণীতে তখনই বিভক্ত হয়ে পড়েছে। তার একদিকে মালিকশ্রেণী, আরেকদিকে মজুর, চাষী এবং খেটে খাওয়া মানুষ। স্বাধীনতা যদি আসে দু'শ্রেণীর হাতেই আসবে আর দু'শ্রেণীই মিলে মিশে দেশকে গড়ে তুলবে — একথা একমাত্র ধাপ্পাবাজরা ছাড়া কেউ বলতে পারে না। ফলে সত্যিকারের কথা হল এই যে, স্বাধীনতা যদি আসে এবং তা যদি মালিকদের হাতে আসে তাহলে মজুরদের মুক্তির লড়াই আরেকবার লড়তে হবে। ইংরেজের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার জন্য মানুষকে লড়তে হয়েছে, কিন্তু ফল চলে গিয়েছে মালিকদের হাতে। ফলে মজুরশ্রেণীকে, খেটে-খাওয়া মানুষকে তার মুক্তি অর্জন করতে হবে আরেকবার। কিন্তু যদি মজুরশ্রেণীর হাতে স্বাধীনতা আসত তাহলে এক স্বাধীনতা লড়াইয়ের মধ্য দিয়েই জনসাধারণেরও মুক্তি অর্জিত হত। তাই স্বাধীনতা আন্দোলনে দু'টি জিনিস ছিল — দেশের স্বাধীনতা এবং গণমুক্তি। স্বাধীনতা হয়েছে, গণমুক্তি হয়নি। জনসাধারণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে। মালিকশ্রেণী ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ফলে এই যে মালিকী ব্যবস্থা, পুঁজিবাদী ব্যবস্থা, এ ব্যবস্থা আজ স্বেচ্ছায় দেশকে দুটো জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে। সেগুলি কী? এ বিষয়ে এখন আমি আপনাদের কিছু বলব।

এক হল এই — গোড়ায় সদ্য সদ্য স্বাধীনতা যখন আমরা সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে পেয়েছিলাম, তারপরে কিছুদিন পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী একটা ভূমিকা ভারতের শাসকশ্রেণীকে রাখতে হয়েছে, জাতীয় বুর্জোয়াদের রাখতে হয়েছে। এদেশের যারা পুঁজিপতিশ্রেণীর প্রতিভূ দল এবং রাজনৈতিক নেতা, তাদের রাখতে হয়েছে। নিজেদের স্বার্থেই রাখতে হয়েছে। তখন তারা ভেবেছে যে, এদেশের অর্থনীতির বিকাশ করতে হলে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে দেওয়া-নেওয়ার একটা দর কষাকষি করতে হবে। আর এই দর কষাকষিতে সাম্রাজ্যবাদী শিবির এবং সমাজবাদী শিবির — এই দুই শিবির থেকে মওকা নিতে হবে। কেউ কেউ বলেন, 'এ তো বরং বুদ্ধিমানের কথা, তা জওহরলাল তো মস্ত বুদ্ধিমান। এ রকম লোকই তো আমাদের দরকার!' আমি বলি, হ্যাঁ, বুদ্ধিটা ভাল। কিন্তু বুদ্ধিটা সাধারণ মানুষদের জন্য, না কি টাটা-বিড়লাদের জন্য? প্রশ্নটা এইখানে। বুদ্ধিটা খুব ভাল। বুদ্ধি খেলানোর মধ্য দিয়ে লাভ হচ্ছে, সুবিধা হচ্ছে। কিন্তু কার হচ্ছে? দেশের মানুষের, না এ দেশের পুঁজিপতিদের? তাদের শাসন সুসংহত হচ্ছে, না জনসাধারণের মুক্তির প্রশ্নটা আরও দ্রুত এগোচ্ছে, না সেটা সুদূর পরাহত হয়ে উঠছে? যত এদেশের বুর্জোয়ারা ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করছে তত গণতান্ত্রিক অধিকার তারা জবরদস্তি কেড়ে নিচ্ছে। তারা তাদের খুশিমতো শাসন করছে। তারা ব্যক্তিস্বাধীনতা, নাগরিক স্বাধীনতাগুলো কেড়ে নিচ্ছে, রাখতে দিচ্ছে না। দেশের অভ্যন্তরে যথেচ্ছভাবে তারা ক্ষমতা ব্যবহার করছে। খাদ্য, মূল্যবৃদ্ধি, শিক্ষা এইসব ন্যূনতম সমস্যাগুলোর কোনও সমাধান করা যাচ্ছে না। আর মজুরদের মুক্তি পুঁজিবাদী শোষণ থেকে, সে তো দুঃস্বপ্ন !

আমি আগেই বলেছি, অনেক কথা এসে যায়, কিন্তু এসে গেলেও আমি যেতে পারব না। যেমন এই

পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে শিল্পের জাতীয়করণ কথাটার মানে কী? তা কি সমাজতন্ত্র ? এর দ্বারা মজুরের মুক্তি আসবে কি ? এর সঙ্গে সমাজতন্ত্রের কোনও সম্বন্ধ আছে কি? সোজা কথায় আমি মনে করি — না। কারণ পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে শিল্পের জাতীয়করণের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় একচেটে পুঁজিবাদ গড়ে ওঠে — যা ফ্যাসিবাদ গড়ে ওঠার সুদৃঢ় ভিত্তি। শিল্পের জাতীয়করণের দ্বারা এদেশে ফ্যাসিবাদের বুনিয়াদ তৈরি হচ্ছে, সমাজবাদ রচনা হচ্ছে না। অথচ এটা সমাজবাদের লেবেল এঁটে করা হচ্ছে। সমাজবাদের মূল কথা অন্য জিনিস। সমাজবাদ হচ্ছে যার দ্বারা উৎপাদনের মূল উদ্দেশ্য পাল্টে যায়, উৎপাদন-সম্পর্ক পাল্টে যায়, রাষ্ট্রের শ্রেণী চরিত্র পাল্টে যায়। আইন-শৃঙ্খলার যে নীতি, তার যে নৈতিক ভিত্তি সেটাই পাল্টে যায়। আমাদের দেশে কি সেরকম হয়েছে ?

এদেশে আইনশৃঙ্খলার যে কাঠামো সেইটা সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহ্য আজও বহন করে চলছে। অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের আইন-শৃঙ্খলার ধারণার সঙ্গে স্বাধীন ভারতের শাসকদের মূলত কোনও বিরোধ নেই। আপনারা লক্ষ করলেই দেখতে পাবেন, ব্রিটিশ আমলে দমনমূলক আইন যা ছিল সেগুলো বাতিল করা তো দূরের কথা, সেগুলোর চেয়েও মারাত্মক আইন এরা প্রবর্তন করে চলেছে। কারণ আজ আর সেইগুলোতেও এদের কাজ হচ্ছে না। সেই একই লাইন ধরে এরা নিত্যনতুন উদ্ভাবন করছে নতুন নতুন আইনের, কী করে আরও কত দমনমূলক ও নিপীড়নমূলক আইন করা যায় এবং সব কিছুই হচ্ছে দেশের নিরাপত্তার নামে। তাই আমি এই প্রশ্নটা গোড়াতেই করেছিলাম — দেশটা কার? টাটা-বিড়লার? নাকি, এদেশে যারা খেটে খায় সেই কোটি কোটি মানুষের? যদি দেশটা এই খেটে খাওয়া মানুষগুলোর দেশ হয় তাহলে দেশের নিরাপত্তা রক্ষার নামে দমনমূলক আইনগুলো তাদেরই উপর প্রয়োগ করার দরকার হত না। বরং এগুলো প্রয়োগ করতে হলে করা হত চোরাকারবারিদের উপর, সমাজবিরোধীদের উপর, সাম্রাজ্যবাদের দালালদের উপর — তাদের উপর এগুলো প্রয়োগ করা হত। কিন্তু উল্টো করা হচ্ছে। এখানে এগুলো প্রয়োগ করা হচ্ছে জনগণের ন্যায়সংগত গণতান্ত্রিক আন্দোলন দমনের জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসাবে। আইন-শৃঙ্খলা বিপন্ন করছে এদেশে কে ? জনগণ নাকি নিজেই ! জনগণকে নিয়েই যদি দেশ হয়, তাহলে সেই দেশের জনগণই নাকি আইন-শৃঙ্খলাকে বিপন্ন করছে ! তাহলে ওদের দেশটা জনগণের দেশ নয়, ওদের দেশটা টাটা-বিড়লার দেশ। তাদের স্বার্থে তৈরি যে আইন ও শৃঙ্খলা, তাদের যাঁতাকলে পিষ্ট সেই দেশের মানুষ সেই আইন-শৃঙ্খলাকে মেনে চলতে পারে না জীবনভর; ভয়ে ধুঁকে অনিচ্ছায় কিছুদিন বয়ে চলে মাত্র। কিন্তু অসহ্য হলেই ফেটে পড়ে, অস্বীকার করতে চায়, ভেঙে ফেলতে চায়। এটাই তো স্বাভাবিক। এতো বারবার ঘটবে এবং ঘটছেও দেশের মধ্যে তাই।

জনসাধারণ আগেও লড়াই করেছে, বর্তমানেও করছে, ভবিষ্যতেও করবে। এই লড়াই কখনও তীব্র আকার ধারণ করছে, প্রচন্ড বিস্ফোরণে ফেটে পড়ছে, আবার কখনও ঢিমেতালে চলছে। লড়াইটা চলছেই এবং চলতেই থাকবে। কিন্তু এই সমস্ত লড়াইয়ের সামনে সব সময়ই দুটো প্রশ্ন বার বার করে দেখা দিচ্ছে। একটা হচ্ছে, দৈনন্দিন সমস্যা ও কতকগুলো আশু দাবিদাওয়ার ভিত্তিতে যে গণআন্দোলনগুলো গড়ে উঠছে — কী সেই আদর্শবাদ যার দ্বারা অনুপ্রাণিত করতে পারলে আন্দোলনের যে মনন তার সামনে একটা স্থির রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে পারে? এবং দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, আন্দোলন পরিচালনার বিভিন্ন স্তরে সংগঠনগত সমস্যার দিকগুলো। এই দুটি সমস্যা, যা আমাদের আন্দোলনগুলোর মধ্যে প্রত্যেকবারই ঘুরে ঘুরে দেখা দিচ্ছে, আমরা যার সমাধান করতে পারছি না। যদি ভবিষ্যতে এর সমাধান করতে হয় তাহলে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি যেভাবে দিনের পর দিন ক্রমশঃই ঘোলাটে হয়ে উঠছে তাকে আগে পরিষ্কার করা দরকার।

আর যে মূল প্রশ্নটিকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক চেতনা আচ্ছন্ন হয়ে আছে তা হচ্ছে, শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শ্রেণীচেতনার উন্মেষের ও বিকাশসাধনের চেষ্টার পরিবর্তে প্রায় সবাই একজোটে 'জাতীয় স্বার্থ', 'জাতীয় পরিকল্পনা', 'জাতীয় উন্নয়ন' এইসব কথাগুলোর জাবর কেটে চলেছেন। এই কথাগুলোর সঙ্গে একটা কথা সর্বদাই মনে রাখতে হবে এবং রাজনৈতিক নেতাদেরও জিজ্ঞেস করতে হবে — মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বলে যারা পরিচয় দেন তাদের তো বটেই অন্যদেরও জিজ্ঞেস করতে হবে — আপনারা 'জাতীয় স্বার্থ', 'জাতীয় পরিকল্পনা', 'জাতীয় উন্নতি' বলতে কোন শ্রেণীর 'স্বার্থ', কোন শ্রেণীর 'পরিকল্পনা', কোন শ্রেণীর 'উন্নতি' বোঝাতে চাইছেন? যদি পুঁজিবাদ বিরোধী বিপ্লবী চেতনার উন্মেষ ঘটানোই আপনাদের উদ্দেশ্য হয় তাহলে প্রত্যেকটি আন্দোলনের সামনে শ্রেণী আদর্শ ও উদ্দেশ্য প্রচারে আপনারা বিমুখ কেন? কিন্তু এসব কথা আমি

বললে কী হবে, এরা যে সব জাতির 'হিরো', জাতীয় নেতা! কেউ ক্লাস লিডার (শোষিতশ্রেণীর নেতা) হিসাবে নিজেকে উপস্থিত করে না। সাহস করে না, ভোটে জিততে হবে বলে। মধ্যবিত্তের ভোট চাই, উচ্চমধ্যবিত্তের ভোট চাই, বড়লোকদের ভোটও চাই। সমস্ত লোকের ভোট চাই। মিলেগুলে না থাকলে সমস্ত লোকের ভোট হয় না। শ্রেণীলড়াই লড়তে গেলে ভোটাভুটিতে বড় অসুবিধে। তাই জ্ঞাতসারেই হোক, আর অজ্ঞাতসারেই হোক, রাজনৈতিক নেতাদের ব্যবহার ও আচরণের পিছনে ভোটাভুটির স্বার্থটাই সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে। লড়াই আমরা সবাই চাই এবং লড়াই আমরা করছিও, কিন্তু যে কায়দায় লড়াইগুলো চালানো হচ্ছে তা বিশ্লেষণ করে দেখলে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠবে — আন্দোলনগুলোর পিছনে যে মূল রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করছে তা মূলত বিক্ষোভ ধর্মী। তাই শুনতে হয়ত খারাপ লাগতে পারে, লড়াইটা মূলত বিক্ষোভমূলক আন্দোলন থেকে যাওয়ার ফলে শেষপর্যন্ত এইসব আন্দোলনগুলি ভোটের বাজার গরম করার আন্দোলনের স্তরেই থেকে যাচ্ছে। তাই আমি বলি, এঁরা লড়াই-টড়াই যা বলছেন সে ভোটের বাজার গরম করার জন্য লড়াই। এ মানুষের মুক্তির উদ্দেশ্যে লড়াই নয়। লড়াই-এর আসল উদ্দেশ্য যে গণমুক্তি, তাকে ত্বরান্বিত করার লড়াই এ নয়। অথচ আমাদের তেমন লড়াই চাই, যে লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে মানুষকে শিক্ষিত করা, ক্রমে ক্রমে মানুষগুলোকে সংঘবদ্ধ করতে করতে গণমুক্তির প্রশ্নটার শেষ মোকাবিলা করা যায়। হয় জনসাধারণের মুক্তি শান্তিপূর্ণভাবে আদায় করব, পুঁজিপতিরা ছেড়ে দেবে আমরা নেব;আর যদি তারা বাধা দেয় তাহলে বিপ্লবাত্মক পথে তার মীমাংসা করতে হবে। কিন্তু মানুষের মুক্তি চাই, মানুষের মুক্তি যে করেই হোক অর্জন করতে হবে, মানুষের মুক্তি আজও হয়নি। দেশের খেটে-খাওয়া মানুষের মুক্তি হয়নি, শ্রেণীশোষণ থেকে তার মুক্তি আজও অপেক্ষা করছে।

তাহলে এইসব নেতারা যারা 'জাতীয় নেতা' হিসাবে নিজেদের বলেন — তাঁরা কখনও দেশের লোকের কাছে কোনও পরিকল্পনার কথা বলার সময়ে বলেন না, পরিকল্পনাটা পুঁজিপতিশ্রেণীর পরিকল্পনা। তাঁরা আলোচনা করেন — এটার এতটুকু খারাপ, অতটুকু খারাপ। আমি বলি, এটার গোটাটাই দুষ্ট। এর তো পুরো উদ্দেশ্যটাই হচ্ছে গোটা পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে আরও সুসংহত করা। সংকট থেকে তাকে কী করে উত্তীর্ণ করানো যায়, কোথাও যদি সে সংকটে আবদ্ধ হয়ে থাকে তাহলে সে সংকট কাটিয়ে আরও কী করে তাকে দীর্ঘজীবী করা যায় তার উপায় উদ্ভাবন করা। তাহলে সেখানে নাট-বলটু পাল্টাবার, এটা ওটা পরিত্যাগ করে একটু এদিক-ওদিক করার সাজেশন দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা তোমার কী ? ওটা তো ওদের গরজ। ওটা তো ঐ শ্রেণীর যারা প্রতিভূ, ঐ শ্রেণীর যারা স্বার্থ-সংরক্ষক তাদের মাথাব্যথার ব্যাপার। তোমার ব্যাপার হচ্ছে, জনতার সামনে এটা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেওয়া যে নাটবল্টু পাল্টানোটা এই পরিকল্পনার আলোচ্য বিষয় নয়। পরিকল্পনাটা খোদ হচ্ছে গোটা দেশকে ডুবিয়ে দেওয়ার, গোটা দেশের মানুষগুলোকে ডুবিয়ে দেওয়ার, পথে বসাবার ষড়যন্ত্র ও পুঁজিপতিদের স্বার্থকে সুসংহত করার ষড়যন্ত্র। আর সেই ষড়যন্ত্রটাই 'জাতীয় স্বার্থ', 'দেশপ্রেমে'র নামে চলছে। আপনারা মনে রাখবেন, দেশপ্রেম, সত্যিকারের দেশপ্রেম বলতে যদি জনগণকে ভালবাসা, জনগণের স্বার্থ রক্ষা না বোঝায় তবে তা প্রকৃত দেশপ্রেম নয়। যে 'দেশপ্রেম' পুঁজিবাদের সেবা করতে শেখায় তা দেশপ্রেম নয়, তা একচেটে পুঁজিবাদের এবং মালিকপ্রথার নির্লজ্জ দাসত্ব। এবং সেই দাসত্বই এদেশে করা হচ্ছে। 'জাতীয় স্বার্থ' সংরক্ষণের বুলি কপ্‌চে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে সেই দাসত্বই করা হয়ে থাকে। তাহলে এই প্রশ্নের সরাসরি মীমাংসা হওয়া দরকার। আমাদের মনে রাখতে হবে, আমাদের দেশ স্বাধীন হয়েছে, পুঁজিবাদী রাষ্ট্রশক্তি পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা কায়েম হয়েছে, পুঁজিবাদী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কাজেই পুঁজিবাদবিরোধী গণমুক্তি আন্দোলন আমাদের কর্মপন্থা, আমাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য — যে গণমুক্তি স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্যেই আমাদের অর্জন করার কথা ছিল, আমরা পারিনি নেতৃত্বের অভাবে। তাই সেই নেতৃত্বের কথাটা, আন্দোলন যখন আমরা করতে যাব তখন আমাদের সামনে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

আন্দোলন এদেশে হয়, এবারও হয়েছে। এবার যে আন্দোলন হয়েছে তা সত্যিই আমাদের দেশের গণআন্দোলনের ইতিহাসে ইতিপূর্বে কখনও ঘটেনি। অসুস্থতার জন্য আমি ব্যক্তিগতভাবে আন্দোলনে জড়িয়ে পড়তে পারিনি, বাইরে ছিলাম চিকিৎসার জন্য। কিন্তু আমি সমস্ত ঘটনা লক্ষ করেছি। সমস্ত ঘটনার সঙ্গেই আমি পরিচিত। এজন্যই পরিচিত যে, আমার পার্টি এই আন্দোলনের একটা শরিক। আপনারা জানেন, আমাদের পার্টি এই আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিল। কাজেই সব খবরই আমি রাখি, কী ঘটেছে, আমি জানি।

সে জানার মধ্য থেকে আমি একটা জিনিস পেয়েছি।

আপনাদের মনে আছে কিনা জানি না। অনেকে হয়ত এর আগেও আমার আলোচনা শুনে থাকবেন, বক্তৃতা শুনে থাকবেন। আমি গতবার* ২৪শে এপ্রিল ঠিক এইখানেই এইরকম একটি সভায় একটা কথা বলেছিলাম। তখন দেশের রাজনৈতিক মহলে একটা কথা খুব চালু ছিল, দেশের মানুষ নাকি লড়তে চায় না। লড়াইয়ের মন নেই, শুধু ইলেকশন-ইলেকশন মন। আমি বলেছিলাম, ভুল কথা। মানুষ আবার লড়বে। কোনদিন যে বোমার মতন ফেটে পড়বে কেউ বলতে পারে না। একথা বলো না যে দেশের মানুষ লড়তে চায় না। হ্যাঁ, মার খেয়েছে; বার বার নেতৃত্বকে বিশ্বাস করে লড়েছে, প্রাণ দিয়েছে। '৫৯ সালে অতবড় একটা মার খেয়ে তার ধকল কাটিয়ে উঠতে পারেনি বলে প্রতিক্রিয়াটা চলছে। তোমরা মনে করছ, আর মানুষ লড়তে চায় না। কিন্তু আবার মার খেতে খেতে সীমা অতিক্রম করে যাবে, তখন এই মানুষগুলো আবার বোমার মতো ফেটে পড়বে। কিন্তু তখনও একটা প্রশ্ন থাকবে, যেটা এদেশে বারবার ঘটছে, সেই প্রশ্নটা হচ্ছে, মানুষ ফেটে পড়ল, ময়দানে এসে গেল, জান দেওয়ার জন্য তৈরি হয়ে গেল; বুকের ছাতি এগিয়ে দিয়ে পুলিশকে বলছে, 'তোদের কত গুলি আছে, তোরা গুলি কর' — এইভাবে মানুষ যখন এগিয়ে আসছে তখন নেতৃত্ব বিকল, থ্রম্বসিসের রোগীর মতো বিকল। নেতৃত্ব শুধু মানুষের বিক্ষোভ দেখে। তারা জানেই না যখন মানুষ নেমে পড়ে তখন এই মানুষগুলোকে কীভাবে সংগঠিত করে তুলতে হয়, কীভাবে তাদের একটা সংগঠিত আর্মিতে পর্যবসিত করানো যায় যাতে একটা দীর্ঘস্থায়ী শৃঙ্খলাবদ্ধ লড়াই হবে, জঙ্গি লড়াই হবে, স্বতঃস্ফূর্ত বিস্ফোরণ হবে না। আমরা যেখানে সেখানে শক্তি ক্ষয় করতে দেব না, যা তা ভাবে কোনও কাজ হবে না। দরকার হলে পিছিয়ে আসব। কিন্তু আঘাত যখন হানব সংগঠিত আঘাত হানব যাকে মিলিটারি দিয়ে, পুলিশ দিয়ে দু'দিনেই স্তিমিত করে দেওয়া যাবে না। বিস্ফোরণমূলক স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের ফলটা কী হয়? আন্দোলনটা আপন গতিতে যতদিন পারে চলে; কিছুদিন চলতে চলতে একটা সময়ে থিতিয়ে যায় আপনা থেকে। এই থিতিয়ে আসার মুখে আমরা নেতারা বলি, 'আর তো আন্দোলনের কিছু নেই, এখন তো আর হবে না, আর তো হতে পারে না। কাজেই এখন একটা সম্মানজনক আপস করে মোটামুটি ইজ্জতটা বাঁচাও।' আর এই যে লড়াইটা হল সেটা নিয়ে খুব তালি বাজাও এবং যে মানুষগুলো লড়াই করল তাদের জোর পিঠ চাপড়াও, খুব বাহবা দাও। মার খেয়ে যা তাদের ক্ষতি হল তা তাদের। যদি জিতি তাহলে তো ভালই। যদি না জিতি, দাবিদাওয়া না আদায় হয়, তাহলেও ক্ষতি নেই। কারণ মানুষ একটু হতাশ হলেও কংগ্রেস বিরোধী হয়ে পড়েই, সরকার ও প্রশাসনের প্রতি তাদের ভয়ানক বিক্ষোভ হয়। আর সেই বিক্ষোভটা আমরা ভোটের কাজে লাগাই। কাজেই বিক্ষোভ তোল, আর বক্তৃতা করে বল, কত লোক লড়ল, কত লোক প্রাণ দিল, কত লড়াই হল! ওটাই যথেষ্ট! আর কিছু দেখবার দরকার নেই। এইটাই তো লড়াই! এ লড়াই হবে, আর এ লড়াইয়ের মওকা আমরা ভোটে ব্যালট বাক্সে নেব। আমি বলি, এই কি নেতৃত্ব দেওয়া ? এতো বারবার ঘটছে এদেশে। একেই আমি বলি বক্তৃতাবাজির নেতৃত্ব। জনগণকে রাজনীতিতে শিক্ষিত করা নয়, সস্তা হাততালি নেওয়া। যে সময়ে মানুষকে বোঝাতে হবে সংগঠন, মানুষকে বোঝাতে হবে আদর্শবাদ, মানুষকে বোঝাতে হবে সংগ্রামের কৌশল, মানুষকে বোঝাতে হবে তারা কী ভাবে লড়বে, এগোবে, পিছোবে — সেই সময়ে শুধু সস্তা হাততালি নিয়ে বাজার গরম করে দিয়ে আমরা চলে গেলাম। এই আমাদের নেতাদের বৈশিষ্ট্য ! আমি একটু নেতাদের সম্বন্ধে বলছি এই জন্য যে, এই নেতাভিত্তিক দেশে মানুষ শুধু নেতার পিছনে পিছনে চলে। আমাদের দেশটা গুরুবাদী দেশ। সে আচার এবং আচরণ আমাদের আজও যায়নি, সে বদভ্যাস আমাদের আজও যায়নি। কাজেই এখানে নেতাদের চরিত্র, তাদের রাজনৈতিক চেতনার মান, বিপ্লবের প্রতি তাদের একনিষ্ঠতা এবং তাদের ব্যক্তিগত আচরণবিধি — এই সবগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। কারণ এই সমস্ত নেতাদের আচরণ থেকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই জনসাধারণ তাদের চরিত্র এবং রাজনৈতিক চেতনা গড়ে তোলে। কাজেই নেতারা যদি সমস্ত প্রকার 'কেরিয়ারিজম'-এর এবং নানা ধরনের সুবিধাবাদ থেকে নিজেদের মুক্ত করতে না পারেন তাহলে জনতার বিপ্লবী চরিত্র, নিয়মানুবর্তিতা এবং রাজনৈতিক চেতনা স্বচ্ছ হতে পারে না। কাজেই আন্দোলনের নেতৃত্বকে শক্তিশালী করার প্রয়োজনেই বহু নেতার চরিত্রে দিনের পর দিন যে সুবিধাবাদ এবং কেরিয়ারিজম-এর ঝোঁক প্রকট হয়ে চলেছে তার তীব্র সমালোচনা হওয়া দরকার বলে আমি মনে করি।

* ১৯৬৫ সাল

আমাদের দেশে যে পার্টিগুলো এতদিন পর্যন্ত আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছে, সেগুলো মূলত ভোটের পার্টি। ও মার্কসবাদী-লেনিনবাদীই হোক আর বাম-ডান কমিউনিস্ট ঝান্ডাই হোক, আর যে তন্ত্র-বাদীই হোক — আসল কথা ইলেকশন পার্টি। গণআন্দোলনের সংগঠন হিসাবে আমরা ইউ এল এফ কমিটিতে আন্দোলনের প্রাক্কালে যতবার বলেছি যে, গণকমিটি, অর্থাৎ আন্দোলনে জনসাধারণের সংগ্রামের হাতিয়ারগুলো গড়ে তোল, তখন ওরা বলে ইউনাইটেড লেফ্‌ট ফ্রন্টের শরিক দলগুলোর প্রতিনিধিদের নিয়ে কমিটি গঠন কর। অর্থাৎ গণকমিটির পরিবর্তে বিভিন্ন পার্টি প্রতিনিধিদের নিয়ে বিভিন্ন স্তরে ইউ এল এফ কমিটি গঠন কর। কিন্তু এই ইউ এল এফ কমিটিগুলো বাস্তবে গণকমিটির যে কাজ তার বিকল্প হতে পারে না। যে মানুষগুলো আন্দোলনে আসে, লড়াই করে, তাদের সাথে নেতৃত্বের সাংগঠনিক যোগসূত্র স্থাপন করতে হলে বিভিন্ন স্তরে আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী জনতার মধ্য থেকে বাছা বাছা লোক নিয়ে গণকমিটি গঠন করা দরকার। তা না করে শুধু বিভিন্ন পার্টি প্রতিনিধিদের নিয়ে ইউ এল এফ কমিটি গঠন করলে সেই কমিটিগুলোর কার্যত পত্রিকায় বিবৃতি দেওয়া এবং নির্দেশ দেওয়া ছাড়া আর কোনও ভূমিকা থাকে না। লোকে যদি লড়তে চায় তো তারা রাস্তায় এসে লড়ে যাবে, আমরা নেতারা দরকার হলে খবর পেয়ে গাড়ি করে গিয়ে সেখানে একটা বক্তৃতা দিয়ে চলে যাব। আমরা জানি না কারা রাস্তায় আসছে, কারা লড়াই করছে, কোথা থেকে তারা আসছে, আবার কোথায় চলে যাচ্ছে। আমাদের অত খোঁজ রাখবার দরকার নেই। তারা রাস্তার লোক, রাস্তায় জড়ো হয়, রাস্তায় মিশে যায়। তাতেই আমাদের কাজ চলে। কেন কাজ চলে? না, তার কারণ হচ্ছে, এই পুরো কর্মকান্ডে যে ক্ষয়ক্ষতিটা তাদের হয় তাতে তাদের কংগ্রেসের প্রতি একটা বীতশ্রদ্ধা হয়, ভয়ানক ঘৃণা হয়। মার খেলে নেতৃত্বেরও যে তারা সমালোচনা করে না তা নয়। কিন্তু নেতারা সব এইরকমভাবে ভাবে যে, আমাদের সমালোচনা করুক আর যাই করুক, এই মানুষগুলো মূলত কংগ্রেসবিরোধী তো! ইলেকশন-এ আমি দাঁড়ালে আমি ছাড়া কাকে ভোট দেবে! না হয় একটু সমালোচনা করলই। এইরকমভাবে যারা ভাবে তারা সব বাস্তুঘুঘু! এই বাস্তুঘুঘুরাই আজকাল দেশের রাজনৈতিক আসর জাঁকিয়ে আছে, নেতৃত্বের অনেকখানি দখল করে আছে।

তাই আমি বলি যে, লড়াইয়ের সামনে আদর্শবাদ চাই এবং একটা সুষ্ঠু সংগঠনগত পরিকল্পনা চাই। একটা লড়াই এমনি হয় না। সংগঠন একটা এমনি হয় না। তার সামনে একটা আদর্শও তুলে ধরতে হবে। কী সেই আদর্শ বামপন্থীরা তুলে ধরেছে, রোজের এই খাদ্য বস্ত্র শিক্ষা চাই — এই সব কথা ছাড়া? কংগ্রেস একটা আদর্শ দেশের লোকের মধ্যে চালাবার চেষ্টা করছে। সেটা হচ্ছে উগ্র জাতীয়তাবাদ। এটাকে তারা দেশাত্মবোধ বলে চালাচ্ছে। বামপন্থীরা কেউ কেউ জনগণতন্ত্র, আবার কেউ কেউ একটা ভাসা ভাসা সমাজতন্ত্র চাই, সমাজতন্ত্র চাই করছে। কিন্তু এই সমাজতন্ত্রটা কী? উগ্র জাতীয়তাবাদের সঙ্গে তার পার্থক্য এবং লড়াই কোথায়? দেশাত্মবোধের সঙ্গে তার মিল কোথায়? জাতীয়তাবাদের সাথে তার কোথায় মিল, কোথায় দ্বন্দ্ব? এসব কোনও কিছুই দেশের মানুষের সামনে পরিষ্কার করা এইসব বামপন্থীরা তাদের গুরুদায়িত্ব বলে মনে করে না। আর এই জিনিসগুলো পরিষ্কার না হলে লড়াইয়ের উদ্দেশ্য পরিষ্কার হয় না, স্বচ্ছতা আসে না জনসাধারণের মনে। সে লড়াইটা হয় অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়া। শুধু একটা বিক্ষোভ, একটা ঘৃণা মনের মধ্যে যেটা রয়েছে তার প্রতিক্রিয়া হিসাবে চোখের সামনে যাকে দেখতে পাই প্রশাসনের প্রতিভূ হিসাবে তারই বিরুদ্ধে আমরা বোমার মতো ফেটে পড়ি। ফেটে পড়তে বাধ্য। আর জনসাধারণ চিরদিন মার খেয়েছে। সে আপন নিয়মে লড়াই করে। মারের প্রত্যুত্তর সে দেয়, নেতা তাকে পথ দেখাক বা না দেখাক। তাই আমি বলতে চাই, আন্দোলনের সামনে আমাদের একটা সুস্পষ্ট আদর্শ চাই-ই। এই আদর্শ আমাদের কী? আমাদের এ আদর্শ সমাজতন্ত্র এবং সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদের আদর্শ। মনে রাখবেন, সমাজতন্ত্র, প্রকৃত সমাজতন্ত্র, সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদের আদর্শ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদের আদর্শ থেকে বিচ্ছিন্ন সমাজতন্ত্র হচ্ছে নিকৃষ্ট সুবিধাবাদ, সম্ভবত উগ্র জাতীয়তাবাদ থেকেও তা নিকৃষ্ট। কিন্তু সে সমাজতন্ত্রও আমাদের দেশের বামপন্থীদের মধ্যে আছে। এ রকম সমাজতন্ত্রী আমাদের বামপন্থীদের মধ্যে আছে যাদের সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রতি কোনও দায়িত্ব নেই। তারা এ ব্যাপারে কোনও দায়িত্ব অনুভব করে না। বরং তারা যে শুধুমাত্র জাতীয়তাবাদী মানসিকতার দ্বারাই পরিচালিত তা নিয়ে তাদের গর্ববোধ আছে। তারপরেও তারা সমাজতন্ত্রের কথা বলে ! কিন্তু তার বিপদ কোথায় ? হয়ত তারাও তা জানে না এবং জনসাধারণকেও আমরা এই ব্যাপারে একেবারেই অন্ধকারে রেখেছি বলা চলে। কিন্তু আমি বলি, দেশের

মানুষকে এই কথাগুলো বুঝতেই হবে। যারা সমাজতন্ত্রের কথা বলবে তাদের অবশ্যই সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদী হতে হবে, কারণ সমাজতন্ত্র সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদ ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না। এছাড়া অন্য যে সমাজতন্ত্র তা ঐ নানাপ্রকার — হয় নেহেরুর সমাজতন্ত্র, না হয় মোরারজির সমাজতন্ত্র, না হয় বার্ট্রান্ড রাসেলের সমাজতন্ত্র, না হয় ইজিপ্টের নাসেরের সমাজতন্ত্র, আর না হয় এইরকমই নানা লোকের নানা সমাজতন্ত্র। কিন্তু তার দ্বারা কোথাও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হওয়ার সম্ভাবনা নেই। হয়ওনি দুনিয়ায়। হয়েছে পুঁজিবাদ, না হয় হিটলার মুসোলিনীর সমাজবাদ, যা এনেছে ফ্যাসিবাদ। তারাও সমাজতন্ত্রের বুলি জোর আওড়েছে। কিন্তু তার দ্বারা মানুষকে ঠকিয়ে তারা এনেছে ফ্যাসিবাদ, সামরিকবাদ, উগ্রজাতীয়তাবাদ, জাতিদম্ভ — সমাজতন্ত্র আনতে পারেনি, আনতে চায়ওনি। তাই সমাজতন্ত্রের আদর্শের সঙ্গে সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদের এই ওতপ্রোত সম্পর্ককে আপনাদের মনে রাখতে হবে। যেখানেই সমাজবাদ সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদের কোনও অবলিগেশন (দায়দায়িত্ব) মানে না সেখানেই সমাজবাদের জোচ্চুরি ধরতে হবে। এ ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই এবং কোনওরূপ আপস করাও চলতে পারে না। এ জোচ্চুরি আপনাদের ধরে ফেলতে হবেই। ধরতে পারলে তবেই আপনারা ছেঁকে নিতে পারবেন যে, তথাকথিত মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের মধ্যে প্রথমেই কারা কারা বাদ হয়ে গেল। তারপরেও মনে রাখতে হবে, কোনও পার্টি সমাজতন্ত্র ও সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদের কথা মুখে স্বীকার করলেই সব শেষ হয়ে গেল না। তারপরে দেখতে হবে, এই সমাজবাদী আদর্শের প্রয়োগ এবং ভারতীয় বাস্তব অবস্থা, ভারতবর্ষের সমাজব্যবস্থার সুষ্ঠু এবং বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ তারা করতে পেরেছে কি না। ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদ, ভারতবর্ষের নৈতিক অধঃপতন, ভারতীয় সমাজের রোগকে তারা ধরতে পেরেছে কি না। সে রোগ কী? নৈতিক অবনতির ক্ষেত্রে রোগ হল আদর্শের ক্ষেত্রে সংকট। আমরা একটা সময়ে দেখেছি, ক্ষুদিরামের যুগে, এদেশে স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগে বাংলাদেশের ছেলে-মেয়েদের 'ফ্লাওয়ার্স অব বেঙ্গল' বলা হত। ঘর ঘর থেকে 'কেরিয়ার' ছেড়ে দিয়ে স্কুল-কলেজের ছেলেরা সব রাস্তায় বেরিয়ে এসেছিল স্বাধীনতার জন্য। ফাঁসিকাঠকে ভয় করেনি, জেলকে ভয় করেনি, অত্যাচারকে ভয় করেনি। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে, কাব্য, সাহিত্য, প্রতিটি ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি মানুষের নতুন নতুন অভিযান। কিন্তু আজ দেখছি কাব্য সাহিত্য সংস্কৃতি প্রতিটি ক্ষেত্রে চলছে মালিকশ্রেণী, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত শ্রেণীর তোষণবাদ। তোষণবাদের মধ্য দিয়ে নির্ঝঞ্ঝাট প্রগতির চর্চা! এমন প্রগতি করতে হবে, যে প্রগতিতে গলাটি বাঁধা পড়বে না। প্রগতিও হবে কিন্তু গলা বাঁধা পড়বার সম্ভাবনা নেই, জেলে যাওয়ার ভয় নেই এবং মালিকশ্রেণীর ডান্ডার ভয় নেই। তেমন নির্ঝঞ্ঝাট প্রগতির চর্চা করতে হবে। রেখে-ঢেকে করতে হবে। সংকটটা হচ্ছে এই আদর্শের সংকট, সাংস্কৃতিক সংকট। আর এই সংকটের বুনিয়াদই হচ্ছে অর্থনৈতিক সংকট যা আমি পূর্বেই আপনাদের সামনে আলোচনা করেছি। ঐ আমেরিকায়ও তাই। টিনএজারদের সমস্যা নিয়ে তারা যে চিৎকার করছে, এটা একটা সমস্যা। এ সমস্যার মূল কারণ তাদের সমাজের বুনিয়াদ-এর মধ্যে। অর্থাৎ আমেরিকান সমাজ আদর্শের সংকটে আজ হাবুডুবু খাচ্ছে। তার আদর্শবাদ সে হারিয়ে ফেলেছে। যে জেফার্সন, লিংকনের জাতীয়তাবাদ, দেশাত্মবোধ, গণতন্ত্রের আদর্শ একদিন আমেরিকান জাতিকে স্বাধীনতাকামী জাতি হিসাবে উদ্বুদ্ধ করেছিল এবং বিশ্বকে আকর্ষণ করেছিল, সেই স্বাধীনতার ধারণা আজ একটি প্রিভিলেজ-এ পরিণত হয়েছে, আজ এই ব্যক্তিস্বাধীনতা আমেরিকান সমাজে একটা সুবিধায় পর্যবসিত হয়েছে। কাজেই যখন কোনও একটা আদর্শ সময়ের গতিপথে সুবিধাবাদে পর্যবসিত হয়ে যায় তখন সে তার বিপ্লবাত্মক এবং প্রগতিশীল চরিত্র হারিয়ে ফেলে। আপনাদের মনে রাখা দরকার, সমাজের অভ্যন্তরে পরস্পরবিরোধী মূল শক্তিগুলোর সংঘাতের ভিতর দিয়ে ইতিহাসে একটা আদর্শ আসে পুরনো আদর্শকে ভেঙে ফেলে দিয়ে একটা নতুন সমাজব্যবস্থা গড়বার জন্য। কিন্তু সেই আদর্শটাও আবার চলতে চলতে একদিন কায়েমী স্বার্থবাদের আদর্শে রূপান্তরিত হয়। তখন সে হয়ে যায় কায়েমী স্বার্থবাদীদের সুবিধা, প্রিভিলেজ। যখন তা প্রিভিলেজ হয়ে যায় তখন সে আর কোনও জাতিকে বা জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে না। তখন সে শুধু কেনা দাস, কতকগুলো চাকরের সৃষ্টি করে, মাইনে করা চাকরের সৃষ্টি করে। কাজেই আজ কাব্য জগতের ক্ষেত্রে, শিক্ষা জগতের ক্ষেত্রে, নাট্য জগতের ক্ষেত্রে, ছাত্রদের মধ্যে সমস্ত জায়গায় শৃঙ্খলার মানে দাঁড়িয়েছে অফিসের আইন-কানুন মেনে চলা আর লেফট-রাইট করা। শিক্ষা মানে হচ্ছে গভর্নমেন্টের ভাল চাকরি পাওয়া, শিক্ষা মানে হচ্ছে এই শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে কারিগরি শিক্ষা এমন অর্জন করা যাতে আমি বড় মিস্ত্রি হতে পারি, বড় ইঞ্জিনিয়ার হতে পারি। আমার মানবিক মূল্যবোধ কত, ইতিহাস

সম্বন্ধে আমার জ্ঞান কত এবং ইতিহাসের তাৎপর্য আমি কত বুঝি, সমাজের মূল্যবোধ আমার মধ্যে কতখানি আছে, মানুষ হিসাবে আমি কী ধরনের — অত কথা দেখার দরকার নেই। কারণ আমি মস্ত বড় শিক্ষিত লোক, আমি একজন ইঞ্জিনিয়ার, আমি নাটবল্টু ঘোরাতে পারি, আমি চার হাজার টাকা রোজগার করি। এই হল সমাজের মনন। এই মননে জাতির মেরুদন্ড ভেঙে যাচ্ছে।

তাই আমি বলছিলাম, যে স্বাধীনতা আন্দোলনের, যে দেশাত্মবোধের, দেশপ্রেমের কথা বললে একদিন এদেশের ছেলেদের জেলে যেতে হত, গলা ফাঁসিকাঠে ঝুলত, সেদিনের দেশাত্মবোধ, জাতীয়তাবাদ ছিল প্রগতিশীল বিপ্লবাত্মক আদর্শ। তাই সেই আদর্শে একদিন জাতি উদ্বুদ্ধ হয়েছে, তার মধ্যে প্রাণচাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। আজ সেই বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ পুঁজিপতিশ্রেণীর হাতে একটা সুবিধায়, সুবিধাবাদী অস্ত্রে পর্যবসিত হয়েছে। আজ যারা জাতীয়তাবাদের কথা বলে তারা আসলে সুবিধাবাদের জাবর কাটছে; দেশের মানুষের জাতীয়তাবাদ কথাটার অর্থ, দেশসেবা করার অর্থ দাঁড়িয়েছে চাকরি করা, গোলামি করা, প্রভুদের খুশি করা। এখানে ভলান্টারি সার্ভিস বলে কিছু নেই। অথচ ডিসিপ্লিন কথাটার কোনও মানে নেই যদি তা ভলান্টারি না হয়। 'তুমি আমার মাইনে করা চাকর, আমি তোমাকে মাইনে দিচ্ছি কাজেই তুমি অফিসের নিয়মকানুন মানবে, না মানলে তোমার চাকরি চলে যাবে।' এই চাকরির ভয়ে তুমি ডিসিপ্লিন মেনে চলছ। এর নাম কি ডিসিপ্লিন? একে ডিসিপ্লিন বলে না। ডিসিপ্লিন কথাটার একটাই মানে, তা সেল্ফ-ইমপোজড (স্বেচ্ছা-আরোপিত)। এই 'ভলান্টারি ডিসিপ্লিন' জাতির চরিত্রের মধ্যে আজ আর নেই বললেই চলে। আসবে কোথা থেকে ? কারণ যে আদর্শবাদ একদিন জাতিকে ডিসিপ্লিন শিখিয়েছিল সে আদর্শবাদ আজকে মালিকশ্রেণী ও শাসকশ্রেণীর হাতে সুবিধাবাদে পর্যবসিত হয়েছে।

আমাদের নতুন আদর্শ চাই। সমাজ একটা নতুন আদর্শের জন্ম দেওয়ার যন্ত্রণায় কাঁপছে। কী সেই আদর্শ, যে এই জগদ্দল পাথরের শৃঙ্খলকে ভাঙতে পারে? তা হল সমাজতন্ত্রবাদের আদর্শ, সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদের আদর্শ, সর্বহারা বিপ্লবের আদর্শ, পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লবের আদর্শ। এই আদর্শে যদি দেশের মানুষকে আমরা উদ্বুদ্ধ এবং অনুপ্রাণিত করতে পারি, সংগ্রামকে গড়ে তুলতে পারি তাহলে দেখব আবার দেশের মধ্যে সেই নতুন প্রাণচাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। আবার মানুষের মধ্যে সেই ক্ষুদিরামের তেজ, আবার ছাত্রদের মধ্যে সেই তেজ ফিরে এসেছে, তার আগে নয়। একথাটাও আমাদের মনে রাখতে হবে।

সর্বশেষে, আমি একটা কথাই বলব, যে কোনও লড়াইতেই হাততালি দেবেন না। লড়াইটা যখন বাধে সবাইকে মিলেই তখন লড়াই করতে হয়। ভুল হোক, শুদ্ধ হোক মানুষকে লড়াই করতে হবে। সবাইকে অবশ্যই লড়াইতে থাকতে হবে। কিন্তু চোখ কান খুলে রাখবেন। বোঝবার চেষ্টা করবেন, এ লড়াইয়ে ফয়দা কার হচ্ছে। কারণ লড়ছি আমরা-আপনারা, সাধারণ মানুষ। ফয়দা ওঠাচ্ছে কতকগুলি রাজনৈতিক টাউট যারা ভোটের মধ্য দিয়ে নিজেদের কেরিয়ার গোছাতে চায়। কাজেই আমরা এই লড়াইগুলিকে যদি মুক্তি সংগ্রামের একটা পরিপূরক সংগ্রাম বলে মনে করি, জনসাধারণের শক্তিশালী মুক্তি লড়াইয়ের পাদপীঠ বলে মনে করি, ধীরে ধীরে এগুলির মধ্য দিয়ে সে মুক্তির লড়াই গড়ে উঠবে বলে মনে করি, তাহলে আমাদের এই লড়াইগুলোর সংগঠনের দিক, এই লড়াইগুলোর আদর্শবাদের দিক ধীরভাবে চিন্তা করতে হবে। এই কথা বলেই আমি আজকে আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ।

*২৪শে এপ্রিল ১৯৬৬ এস ইউ সি আইয়ের*
*প্রতিষ্ঠা দিবসে কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে প্রদত্ত ভাষণ।*
*১৯৬৬ সালের মে মাসে দলের বাংলা মুখপত্র*
*গণদাবীতে প্রথম প্রকাশিত।*